আলমডাঙ্গায় জাতীয় কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন

আলমডাঙ্গায় উদ্ভাস সাহিত্য সংস্থার আয়োজনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১টায় উদ্ভাস সাহিত্য পরিষদের কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সারস্বত বাণী

“আমাকে ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। আমি কবি হতে আসিনি। আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, আমি প্রেম পেতে এসেছিলাম। সে প্রেম পেলাম না বলে, আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নিরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম” এই মহান বাণীকে ধারণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্ভাস সাহিত্য সংস্থার সভাপতি কবি কহন কুদ্দুসের সভাপতিত্বে উদ্ভাসের হাইরোড কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাহিত্যিক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক আনোয়ার রশীদ সাগর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাধবপুর মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান আবেদ, গবেষক হেলাল উদ্দিন, প্রাবন্ধিক কামরুজ্জামান টুটুল, জি.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশীদ, ইসলামি কথাসাহিত্যিক মোহাম্মদ শাহ আলম নান্দী, ছড়াকার মো. মানোয়ার হোসেন, রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

মেহেরপুরের নাসিমা আনিস পেলেন বাংলা একাডেমির কথাসাহিত্য পুরস্কার

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জন্য আজ এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। জেলার কৃতি কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিস অর্জন করলেন দেশের অন্যতম সম্মানজনক স্বীকৃতি— বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫। তিনি এবার কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেলেন।মেহেরপুরে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করছেন। এ অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং মেহেরপুরবাসীর জন্য এক অনন্য সম্মান ও আনন্দের উপলক্ষ।

নাসিমা আনিস মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহ্যবাহী বল্লভপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হাবিব আনিসুর রহমানের সহধর্মিণী। পারিবারিকভাবেও তাঁদের সন্তানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইতিপূর্বে মেহেরপুরের লেখক রফিকুর রশীদ শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০২১)পান।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এবার ৯ জনকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অমর একুশে বইমেলা-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখায় ৯ বিশিষ্টজনকে এই পুরষ্কার তুলে দেন ।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ প্রাপ্তরা হলেন-কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিস; প্রবন্ধ/গদ্যে সৈয়দ আজিজুল হক; শিশুসাহিত্যে হাসান হাফিজ; অনুবাদে আলী আহমদ; গবেষণায় মুস্তাফা মজিদ ও ইসরাইল খান; বিজ্ঞানে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ও মুক্তিযুদ্ধ মঈদুল হাসান।

কথাসাহিত্যে নাসিমা আনিসের অবদান দীর্ঘদিনের। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সমাজবাস্তবতা, মানবিক টানাপোড়েন, নারীর আত্মসংগ্রাম ও সময়চেতনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। “কাঞ্চনের জন্য ভালোবাসা”, “চন্দ্রভানুর পিনিস”, “বৃহন্নালা বৃত্তান্ত”, “সূর্য ওঠার সময়”, “কুয়াশা কুয়াশা ভোর”, “স্বপ্ন আমার বাঁচবো”, “মোহিনীর থান”,

“কিডনির কারবার” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর গল্প “কয়লা নামে কোনো জায়গা নেই” সমকালীন সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে অনার্সসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ঢাকার ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষকতা জীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীর প্রেরণার উৎস ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে তিনি বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ‘আবু রুশদ সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন (২০২৪), যা তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

মেহেরপুরবাসীর পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক নাসিমা আনিসকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর সাহিত্যসাধনা আরও সমৃদ্ধ হোক, বাংলা সাহিত্য ভান্ডার তাঁর কলমে হোক আরও আলোকিত—এই প্রত্যাশা রইল।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আলোচনা সভা

“তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের একত্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল ইসলাম অ্যাসোসিয়েশন হলে এই সভা হয়।

এ আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী চুয়াডাঙ্গা, জেলা শিল্পী কল্যাণ পরিষদ চুয়াডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

আবৃত্তি পর্ষদ, প্রগতি লেখক সংঘ চুয়াডাঙ্গা এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র- চর্চায়ন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিরন-উর-রশিদ শান্ত ও চুয়াডাঙ্গা আবৃত্তি পরিষদের পরিচালক মনোয়ারা খুশি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও দর্শনা সরকারি কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড.মুন্সী আবু সাইফ, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি নজির আহমেদ, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাজল মাহমুদ, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্র-চর্চায়নের কার্যকরী পরিচালক পিন্টু রহমান, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি হাবিবি জহির রায়হান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৯৭তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

গত ৯ই ডিসেম্বর নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস স্মরণে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, আব্বাস উদ্দিন, লতিফা রহমান বনলতা, ফুয়াদ আল মুকতাদির, মর্জিনা খাতুন, চিত্ত রঞ্জন শাহা চিতু, খালেকুজ্জামান, হুমায়ুন কবীর, মো: আবু নাসিফ খলিল, মিম্মা সুলতানা মিতা।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন, ইকবাল আতাহার তাজ, হুমায়ুন কবীর, গোলাম কবীর মুকুল ও আবু নাসিফ খলিল।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, রাবেয়া খাতুন রাবু। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘পদধ্বনি’ আসরের ১৫৯৭তম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের মাসিক সাহিত্য বাসর

মেহেরপুরের অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের উদ্যোগে মাসিক সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সাহিত্য বাসরে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি রফিকুল আলম এবং সহ-সভাপতি নুরুল আহমেদ।

সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সায়েদুর রহমান সাজু, শিক্ষক ও কবি মো. আনিছুর রহমান, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মো. শাহজাহান ও সমাজকর্মী দিলারা পারভীন প্রমুখ।

সাহিত্য বাসরে কবিতা পাঠ করেন কবি রফিকুল আলম, ম. গোলাম মোস্তফা, মেহের আমজাদ, এস. এম. এ. মান্নান, আবুল হাসেম, রফিকুল

ইসলাম, ডা. মহিবুল ইসলামসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবি, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে মিলনায়তন মুখরিত হয়ে ওঠে।

লালনোত্তর মরমি বাউল সাধক “বেহাল শাহ”

বাউলসম্রাট লালনের গান জনপ্রিয় করতে যাদের অবদান অপরিসীম, তাদের অন্যতম আলমডাঙ্গার ফরিদপুরের মরমি বাউল সাধক ও গীতিকার বেহাল শাহ।

লালনোত্তরদের কেউ কেউ বলেন, লালনের গান এখন যেভাবে সাধকদের মাঝে গাওয়ার ঢং বা ঠাট, সুরের যে বৈশিষ্ট চালু আছে; এটা লালনোত্তর কয়েকজন মরমি সুর সাধকের অবদান । এঁরা হলেন – অমূল্য শাহ, শাহ কলিমউদ্দিন ওরফে কালু শাহ, বেহাল শাহ, মহিন শাহ, খোদা বক্স শাহ (জাঁহাপুর) ও মকছেদ আলী সাঁই। এদের মধ্যে বেহাল শাহর প্রভাব ব্যাপক বলে স্বীকার করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার নাগদাহ মাতুলালয়ে বলেশ্বরপুর গ্রামে ১৩০৭ সনের ২৫ চৈত্রে জন্ম বেহাল শাহ’র। বাবা-মায়ের নাম যথাক্রমে বাহাদুর শাহ ও ময়না নেছা বিবি। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া। পৈতৃক নিবাস পোড়াদহ রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী খর্দ আইলচারা গ্রামে। প্রথম জীবনে লেটো দলে ছিলেন বলে জানা যায়। পরে দেলবার শাহ ঘরানার ছমির চাঁদের কাছে দীক্ষা নেন।

অমূল্য শাহ, শুকচাঁদ, খোদা বক্স প্রমুখের কাছে লালনগীতি শিখে এ গানের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এমনকি লালনগীতির বর্তমান গায়কী ধারার অন্যতম প্রবর্তক তিনি। বেহাল শাহের দ্বিতীয় স্ত্রী দৌলতুন্নেছা। তাদের রয়েছে এক কন্যাসন্তান। নাম আয়েশা খাতুন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ৭শ ফকিরের গ্রামখ্যাত ফরিদপুরে অতিবাহিত করেন। তিনি মঞ্চে আপেক্ষিক ও উদ্ভব

প্রসঙ্গ নিয়ে গান বাঁধতে পারতেন বলে জানা যায়। তাঁর লেখা গানের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। তবে অনেক বাউল দাবি করেন তার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৯ শ। এখনও বেহাল শাহ’র দরাজ কন্ঠের মরমি গীতির অকুন্ঠ প্রশংসা করেন।

১৯৬৫ সালে দোলযাত্রার দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক শাষনকর্তা মোনায়েম খান লালনের আখড়া ধামে এসে সকল বাউল সাধক শিল্পীর উদ্দেশ্যে স্ব স্ব আসনে বসে গান লিখে পরিবেশন করতে বলেন।সেই গান যেন উপস্থিত সময়ে লেখনী সেটা যেন গানের মাঝে পরিস্কার ভাব বাচন ভঙ্গি সজাগ থাকে।উপস্থিত পাঁচ শতাধিক বাউল সাধক শিল্পীর মধ্যে বেহাল শাহ প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বেহাল শাহ কে বাউলকূলের শীরমণি উপাধিতে ভূষিত করেন।সঙ্গে পরিয়ে দেন গলায় মেডেল, প্রশংসাপত্র ও নগদ পাঁচশত টাকা।

সমঝদারদের অনেকে দাবি করেন সমসাময়িক কিংবা আজোবধি বেহাল শাহ’র মত দরাজ ও পরিশীলিত কন্ঠ আর শোনা যায়নি। ১৩৮৮ সনের ১৮ ভাদ্র (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১) এই মরমি সাধক শিল্পী ও গীতিকার-সুর সাধকের তিরোধান ঘটে। কোরান ও হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ এবং মিথের উপর তার অসাধারণ দখল ছিল। তাকে সর্ব শাস্ত্রভূত জ্ঞানী পন্ডিত বলা হত।

বেহাল শাহ’র গুণগ্রাহী অনেক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন প্রয়াত মাওলাবক্স পাগল। যিনি গানে এবং প্রজ্ঞায় অসাধরণ ছিলেন । ২০১২ সালের ১৬ আগস্ট মাওলা বক্স প্রয়াত হন। এছাড়াও ঝড়ু ক্ষ্যাপা, ফরিদপুরের রইচ উদ্দীন শাহ,রফিউদ্দিন শাহ,জীবন ফকির,রেয়াজ শাহ,রবিউল শাহ,মকছেদ শাহ,ছাবিনা খাতুন,আমোদ আলি শাহ,আজিত শাহ বেহাল শাহ’র অন্যতম শিষ্য। আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে অবস্থিত এই গুণী ব্যক্তির মাজার দীর্ঘদিন অরক্ষিত রয়েছে। তিনি লালনগীতির গায়কী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত এবং তাঁর গান বাংলাদেশ ও ভারতের অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে আজও বিদ্যমান।

সাংস্কৃতিক অবদান ও জনপ্রিয়তা বেহাল শাহ লালনগীতির গায়কী ধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। তিনি লালনগীতির বর্তমান জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

অমূল্য শাহ, শুকচাঁদ, খোদা বক্শ প্রমুখের কাছ থেকে লালনগীতি শিখে তিনি নিজেই এই গানের জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ

করেন। তাঁর গাওয়া গান বাংলাদেশের ও ভারতের অনেক ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়।

মেহেরপুরে ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংগঠন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” তাদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ এবং সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা স্রোতের ১৯০তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের সভাপতি অ্যাড. এম. আনোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল-আমীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. এম. এ. বাশার, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ এবং রফিকুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি নূরুল আহমেদ। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, নাট্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাহিত্য সম্পাদক মিনা পারভীন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু লায়েছ লাবলু, নির্বাহী কমিটির সদস্য নিলুফার বানু, মোমিনুল হক, আবুল হাসেম, সাদিকুজ্জামান সেন্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন শেষ হয়।

অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার প্রয়াত আব্দুর রশিদ ও আবুল কাশেম স্যার

ফেসবুকের নীল পর্দা স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। নিউজফিডে ভেসে উঠলো দুটি পরিচিত মুখ—আমাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয়, এখন আর না-ফেরা মানুষ—প্রয়াত আব্দুর রশিদ স্যার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম স্যার। যেন সময় এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। ছবিগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে ফিরে এল বহু বছরের জমে থাকা মধুর সময়গুলো।

এই দুই গুণী মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক শুধু পরিচয়ের গণ্ডিতে আটকে ছিল না—ছিল একসাথে হাসি, গল্প, আড্ডা আর অসংখ্য অমূল্য মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য। আজ সেই অমলিন স্মৃতির কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে বসেছি।

স্মৃতির পথে পথে
গাংনী উপজেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের আয়োজনে “কমিউনিটি ফিলানথ্রপি” কর্মসূচি ছিল আমাদের মিলনমেলা। দুই মাস অন্তর আমরা যেতাম যশোর আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারে—কখনো ট্রেনে, কখনো বাসে, কখনো মাইক্রোতে। পথে ক্লান্তি বলে কিছু ছিল না।

মাইক্রোবাস ভর্তি প্রাণবন্ত মুখগুলো লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন স্যার, করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মানিকদিয়া গ্রামের বীরমুক্তিযোদ্ধা ও কবি মোজাম্মেল হক, রাজনীতিক লাইলা আরজুমান বানু আপা, মনিরুজ্জামান আতু ভাই, আর দুই প্রিয় সঙ্গী—আবদুর রশিদ স্যার ও আবুল কাশেম স্যার।

যাত্রাপথ মানেই ছিল হাসি, ঠাট্টা আর গল্পে ভরা এক উৎসব। পল্টু স্যারের রসিকতা, জাকির স্যারের মজার উপমা, কাশেম স্যারের তীক্ষ্ণ জবাব—সব মিলিয়ে সময় যেন উড়ে যেত। আর এইসব প্রাণোচ্ছ্বল মুহূর্তের মাঝেই আব্দুর রশিদ স্যার থাকতেন নীরব শ্রোতা। মাঝেমধ্যে হাসির গল্পের পুনরাবৃত্তি চাইতেন, আর বাকিদের উল্লাস দেখে মৃদু হেসে চুপচাপ থাকতেন। তার নীরবতাতেও ছিল এক ধরনের উষ্ণতা।

**আব্দুর রশিদ স্যার ছিলেন—হিসেবী, প্রতিবাদী, সৎ, অনুসন্ধিৎসু, সময়ানুবর্তী ও অত্যন্ত সৎ মানুষ। দেনাপাওনার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদে ছিল নিজস্ব আভিজাত্য—পাঞ্জাবি-পাজামা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তার স্টাইলেও ছিল সেই ছাপ।

ফেসবুকে তার পোস্টগুলো কখনো কবিতার মতো কোমল, কখনো রাজনৈতিক প্রবন্ধের মতো তীক্ষè। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক কণ্ঠস্বর ছিলেন তিনি। এজন্য সমালোচনা, এমনকি হুমকিও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সত্য বলার সাহস কখনো হারাননি।

তিনি প্রযুক্তির সাথেও ছিল ভীষণ সখ্য। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সাহিত্যকর্ম লিখতেন, নতুন কোনো অপশন বা যুক্তাক্ষর লিখতে না পারলে ফোন দিতেন—“ভাই, এটা কিভাবে করবো?”
ঢাকার দেয়াল বনাম গ্রামের মুক্ত বাতাস :
ঢাকায় থাকার সময় ফোন করে বলতেন—
“ছোট ভাই, এই চার দেয়ালের মধ্যে ভালো লাগে না।”
আমি মজা করে বলতাম—
“স্যার, আপনি শহরের কোলাহল ছেড়ে চলে আসেন গ্রামীণ মুক্ত বাতাসে। যেখানে ধানের শীষ দোলে, পাখি গান গায়, খালের পানি ছুটে চলেৃ” তিনি মুচকি হেসে বলতেন—
“আমার তাপুর মেয়েটার জন্য থাকতে হচ্ছে। ওকে দেখবে কে?”আমার লেখার পাঠক :
আমি যখন কোনো গান বা কবিতা ফেসবুকে দিতাম, তিনি সবার আগে পড়তেন এবং প্রশংসা করতেন—হয়তো উৎসাহ দেওয়ার জন্যই। একদিন বলেছিলাম— “স্যার, আপনার লেখা বই আকারে বের করুন।”
তিনি রাজি হয়েছিলেন। পরে অগ্নি যুগের অগ্নি সেনা প্রকাশ করলেন । দুর্ভাগ্যবশত, সেই প্রকাশনা উৎসবে আমার থাকা হয়নি—সেই আফসোস আজও রয়ে গেছে।
শেষ কথা
আজ শুধু আব্দুর রশিদ স্যার নয়, আবুল কাশেম স্যার, সিরাজুল ইসলাম স্যার, মোজাম্মেল হক আঙ্কেল, জাকির স্যার, পল্টু স্যার—সবাই আমার জীবনে কখনো বাবার মতো, কখনো বন্ধুর মতো, কখনো অভিভাবকের মতো ভালোবাসা দিয়ে গেছেন।
যারা বেঁচে আছেন—তাদের জন্য সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি। আর যারা চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করছি, আমিন।

(অসমাপ্ত স্মৃতিচারণ)

মুলির আয়নায় পেছনের পথ

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের সবচেয়ে সরু গলিটায় থাকে বুদু শেখ। মানুষ যাকে “মুলি” নামে ডেকে ডেকে ক্ষুদ্র করে দিয়েছে। সাড়ে তিন ফুটের শরীরটা কারো হাসির খোরাক, কেউ ভাবে প্রাকৃতিক। কিন্তু মুলির চোখে জীবন শুধু একটা লরি, যার চাকায় ঘুরে যায় রুটির হিসাব।

তার বাবা, একজন মৃতপ্রায় দিনমজুর, জীবনের শেষে বিছানায় শুয়ে কেবল একটা কথাই বলে গেছেন বারবার: “মানুষ হবি, গায়ের আকারে না, মনে। চাকা ঘুরা থামায় দিস না।”
বাবা চলে যাওয়ার দিন মুলির বয়স মাত্র বারো। সে জানত, কাঁদা নিষেধ। কারণ, কান্না গরিবের রোজগার বন্ধ করে দেয়।
বাস টার্মিনালের ধুলোতে মুলির কৈশোর গলতে থাকে। নোংরা হেলমেট, গ্রীজ মাখা শার্ট, আর লরি চালকদের অশ্রাব্য হাসাহাসিতে সে

ধীরে ধীরে একটা শব্দের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে: “চালাবি?” প্রথমবার, এক মাতাল চালক কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিল। মুলি মাথা নিচু করে বলেছিল,
“শিখতে চাই। শুধু শেখা।”

কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু সে থেকে গিয়েছিল। চাকা ধুতো, পাম্প করতো, প্যাডেল টিপে ব্রেক কষার কায়দা শিখত পেছন থেকে। ধীরে ধীরে, হেলপার থেকে সহকারী।

একদিন এক চালক বলেন,
“তুই ছোট মানুষ না, তুই হলি চাকার নিচে চাপা পড়া মাটির ছায়া।” এই কথা তার মগজে থেকে যায়। পুরোনো এক লাল-কালো লরি। ইঞ্জিনে দম্ভ, দরজায় আঁচড়ের নকশা, নম্বর প্লেট ঝাপসাÑ তার হাতে আসে। লাইসেন্সটাও হয়, যদিও অফিসের এক ‘ভাই’-কে খুশি করতে হয়েছিল এক রাতের কাজ দিয়ে।

এপ্রিলের এক পাগল করা রাতে মুলি পাথর বোঝাই লরি নিয়ে ফিরছিল সিলেট থেকে। নির্জন রাস্তা। চারদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। চাঁদের আলোয় পিচ রাস্তা সাপের মত চকচক করছে।

গাড়ির গতি ৮০ কিমি। হঠাৎ এক শব্দ! চিৎকার নয়, যেন পাতা চাপা পড়ার আওয়াজ।
চোখের সামনে এক বৃদ্ধা। সবকিছু ঘটে যায় এক সেকেন্ডে। বুড়ি শুয়ে ছিলেন রাস্তার পাশে। ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। চাকা চলে যায় তার পায়ের ওপর।

মুলির বুক ধক করে ওঠে। হাত কাঁপে, পা কাঁপে, কিন্তু সে গাড়ি থামায়।
লরি আলো ফেলে রেখেছে একফালি আলোকছায়া। বৃদ্ধা কাতরাচ্ছেন। রক্তের ছিটে গরম পিচে শুকিয়ে যাচ্ছে।
চারপাশে কেউ নেই। নিঃশব্দ এক শূন্যতা। কুকুরও নেই।
মুলি হাঁটু গেড়ে বসে। বৃদ্ধার মুখে পানি দেয়। বৃদ্ধা চোখ খুলে তাকান, কিন্তু কিছু বলেন না। শুধু হালকা শব্দে “মা,” বলে যেন দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে চান।
তখনই আসে প্রশ্নটা।

“এই বৃদ্ধ বাঁচলেও কী হবে? চিকিৎসা করতে পারবে না। ঘরে অভাব। হয়তো ছেলে-মেয়েরা তাকে বোঝা ভাববে। আমি যদি এখনই শেষ করে দিই; তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারি।”
এই ভাবনা তার নিজের নয়। সেটা সে জানে। কিন্তু কখনও কখনও মানুষের মধ্যে একটা অন্ধরূপ জন্ম নেয়Ñ অতিমাত্রায় যুক্তিভিত্তিক, নির্দয় এক বিবেক।

সে লরি পিছিয়ে নেয়। এবার পুরো বুকের উপর তুলে দেয় চাকা। মুলি লরি ছালিয়ে চলে আসে মেহেরপুর। তবে ঘুম আসে না মুলির। তবু অদ্ভুতভাবে শান্তি লাগে। এক নিষ্ঠুর আত্মতৃপ্তি। যেন জীবনকে একবার বশে আনতে পেরেছে সে।
পরদিন পত্রিকায় খবর: “রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা কোরবান নামে এক দিনমজুর বৃদ্ধ লরি চাপায় নিহত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধটি ঘুমঘোরে অসাবধানতাবশত রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন।”

মুলি চা খায় রাস্তার ধারের দোকানে। পত্রিকা হাতে। চোখ যায় নিজের হাতের দিকে। মনে হয় হাতটা কাঁপছে। চা-ও ভালো লাগে না আবার লাগে। জীবন যেমন চলে, পাপও চলে সাথেই।

তবে তারপর থেকে কিছু বদলে যায়।

মাঝরাতে এক অদ্ভুত ঘুম ঘিরে ধরে মুলিকে। সে দেখে তার লরির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ, একই কাপড়, একই মুখ, একফালি হাসি নিয়ে। কখনও তার দরজা খুলে যায় নিজে নিজে। কখনও ব্রেক ধরে না। সে জানে, কিছু একটা আছে, যা রয়ে গেছে।
একদিন লরির আয়নায় হঠাৎ দেখে এক জোড়া চোখ। পেছনে কেউ নেই। তবু চাকা ঘোরে না।
আজও মুলি চালায়। তবে আয়নায় সবসময় খোঁজে কিছু। এক মুখ, এক চোখ, এক ভার।

পাপ যেমন চাপা থাকে, তার একটা ওজন থাকে। সেটা গরিব হোক, চালক হোক, ছোট মানুষ হোকÑ ভুল কখনো ছোট হয় না।
মুলির চাকার নিচে শুধু রাস্তাই থাকে না, থাকে তার অতীত। আর যখনই সে নতুন হেলপারদের শেখায়, চাকা ঘোরাতে দেয়, সে কেবল একটা কথাই বলে।

“যার ওপর দিয়েই যাও, আগে দেখে নিওÑ তোমার নিজের ছায়া পড়ে আছে কিনা।”
বৃদ্ধকে পিষে ফেলার পর প্রথম তিন রাত মুলি ঘুমোতে পারেনি।

চোখ বন্ধ করলেই সে এক দৃশ্য দেখেÑ রাস্তার মাঝে একটি কুঁচকে যাওয়া শরীর পড়ে আছে। তার চারপাশে শুধু পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আর লাল রক্তের রেখা আঁকা হয়ে গেছে লরির চাকার পেছনে। আর সেই বৃদ্ধ তাকিয়ে আছেন। কোনো অভিশাপ নয়, কোনো ঘৃণা নয়, বরং এমন এক দৃষ্টি, যেন তিনি কিছু বুঝতেই পারেননি। এই “না বোঝা” টাই মুলিকে গিলে খায়।

সে ভাবে “যদি তিনি চোখে চোখ রেখে কেবল একটা গালি দিতেন, তাহলে সহজ হতো। কিন্তু কিছুই তো বললেন না… এমন কি, মৃত্যুর আগে আমাকে ক্ষমাও করে দিলেন কী? মুলি চেষ্টা করে স্বাভাবিক হতে। চা খায়, হেলপারদের সাথে আড্ডা দেয়, চালায় প্রতিদিনের মতো।কিন্তু তার মধ্যে দুইটা মুলি তৈরি হয়েছে।

একটা লরি চালায়। আরেকটা প্রতিদিন তার ডান কাঁধে বসে কানে কানে ফিসফিস করে বলে “তুই খুনী, মুলি। তোর লরি একদিন তোর দিকেই ফিরবে।”

সে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধদের দেখে না তা যেন ভয়। কখনও গাড়ি

চালাতে চালাতে ব্রেক ছাড়তে ভয় পায়, মনে হয়, হঠাৎ যদি আরেকটা বৃদ্ধ চলে আসে?

সে একবার খোঁজ নিয়েছিল বৃদ্ধ’র পরিবারের। জেনেছিল বৃদ্ধ কোরবান ছিলেন নিঃসন্তান। আশেপাশের লোকজন বলেন,
“তাঁর কারো ওপর ভরসা ছিল না। একা থাকতেন, ভিক্ষা করতেন। কিছু ছিল না হারানোর মতো।”
এই কথাগুলো শুনে মুলির কিছুটা স্বস্তি লাগার কথা ছিল। কিন্তু বরং মনে হয়,

“যার কিছু নেই, তার তো আমিই সব ছিলাম। এমন এক লোকের জীবন আমি কেড়ে নিলাম, যার জন্য কেউ কাঁদেওনি।”
একদিন এক মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভিতরে ইমাম সাহেব বলছিলেন।

“আল্লাহ ক্ষমা করেন, যদি পাপি অনুতপ্ত হও। কিন্তু যার ওপর জুলুম হয়েছে, যদি সে না করে, তবে সেদিন হিসাব হবে।”
মুলির চোখ ফেটে পানি আসে। সে একা বসে থাকে, মসজিদের পেছনে, মাথা নিচু করে।
ভেতর থেকে একটা কান্না আসে। কিন্তু এটা চোখ দিয়ে না, আসে বুক দিয়ে, হাড়ের ভেতর দিয়ে।

তারপর থেকে মুলি বদলে যায়। সে নিয়মিত এক নির্জন জায়গায় যায়। এক পুরনো গাছের নিচে যেখানে বৃদ্ধ’র দেহ পড়ে ছিল। সেখানে একটা ছোট পাথর বসিয়েছে, কোনো নাম লেখা নেই, শুধু একটা ছোট লাল কাপড় বেঁধে রেখেছে শাখায়।
সে দাঁড়িয়ে বলে,

“আমি জানি আপনি কেউ ছিলেন না। কিন্তু আমার জন্য আপনি ছিলেন। আমি জানি আমি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য না। কিন্তু আমি প্রতিদিন লরি চালিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছি… একদিন আপনিই থামাবেন আমার গাড়ি।”

আজও মুলি লরি চালায়। চালায় তার গন্তব্যের জন্য না, চালায় যেন পাপকে পেছনে ফেলে পালাতে।

আয়নায় সে শুধু রাস্তা দেখে না, দেখে এক মুখ। যে মুখ কিছু বলেনি, তবু সব বলে গেছে। কারণ পাপ যেমন চাপা থাকে, তার একটা ওজন থাকে। আর সেই ওজন চাকার মতো ঘুরে ঘুরে একদিন থেমে যায় ঠিক সেখানেই, যেখানে ক্ষমা শেষ হয়।

মুলির বয়স এখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই। গায়ের আকারটা আগের মতোই সাড়ে তিন ফুট, কিন্তু চোখের নিচে কালি, মুখে দাড়ির ছাঁট নেই, পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে লরি চালাতে চালাতে।

সে এখন আর আগের মত বেপরোয়া গতিতে লরি চালায় না। রাতে কম চলে, দুপুরে থামে বেশি। হেলপাররা ভাবে, “বুড়া হয়ে গেছে।” কিন্তু আসলে, মুলির মধ্যে এখন একটা ধীরে ধীরে পুড়তে থাকা অভিযুক্ত সময় জমে আছে।

প্রতিটা বাঁকে সে এখন দেখে। “এই জায়গাটা সেই নয় তো?” প্রতিটা বৃদ্ধ রিকশায় চড়লে সে খেয়াল করে, পা কাঁপছে কিনা। একবার তো গাড়ি থামিয়ে এক বৃদ্ধকে রাস্তা পার করিয়েছে। হেলপার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,

“কীরে ভাই, কী হলো?” সে কেবল বলে, “বৃদ্ধরা জানে না, কার গাড়ি কত পাপ নিয়ে চলে।
একদিন, হঠাৎ করেই এক ছেলেকে লরি চাপা দেয় মুলি।

নতুন হেলপার তখন স্টিয়ারিং ধরেছিল, কিন্তু মুলিই ছিল তত্ত্বাবধানে। ছেলেটি ছিল মানসিকভাবে অক্ষম। হঠাৎ করে রাস্তা পার হতে গিয়েছিল।

চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। পুলিশ আসে, গ্রামবাসী ঘিরে ধরে। এক বৃদ্ধ লোক বলে,
“এই চালক আগে এক বৃদ্ধকেও মেরেছিল, শুনছি।”

মুলির মুখ তখন পাথরের মতো। সে পালায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। এক পুলিশ অফিসার বলে, “তুমি দায়ী না সরাসরি। কিন্তু তোমাকে আটকাব তদন্তের জন্য।” মুলিকে থানায় নেওয়া হয়। থানার একটি ছোট কক্ষে সে বসে থাকে একা। চোখ বন্ধ করলে, আরেকটা কক্ষ মনে পড়ে। লরির ভেতরের কেবিন। চোখ খুললে দেখে, সামনে দেয়ালে টাঙানো একটা আয়না।

নিজের চোখের দিকে তাকায়। মনে পড়ে সেই রাত। বৃদ্ধ’র মুখ। তারপর মনে পড়ে তার বাবার কথা। “মানুষ হবি, গায়ের আকারে না, মনে। মুলি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তিনদিন থানায় থেকে যায়। চতুর্থ দিন সকালে, ছেলেটির মা থানায় আসে। বিপরীত দিক থেকে ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ায় মুলির সামনে। চোখে পানি নেই। ঠোঁটে শুকনো দাগ।

“শুনছি তুমি খারাপ না। এক বৃদ্ধকেও নাকি একা দাফন করছিলে একসময়।

ছেলেটা আমার ছিল না ঠিক করে, আমরাই তাকে পালতাম। এখন নাই। বাকি জীবন তুমিও বোঝা বইবা।” মুলি কিছু বলে না। নারীটি চলে যায়। সেই রাত, ছাড়া পেয়ে মুলি আবার লরি চালায়। কিন্তু এবার গন্তব্য নির্দিষ্ট।

সে সোজা চলে যায় সেই জায়গায়Ñ যেখানে কোরবান বৃদ্ধ’কে পিষেছিল। বছর সাতেক আগের ঘটনা। গাছটা এখনও আছে। আগের কাপড়টা নেই। সে এবার পকেট থেকে এক নতুন কাপড় বের করে। তাতে হাত দিয়ে লেখে। “আমি বুঝি। আপনি চুপ ছিলেন, আমি আর চুপ থাকতে পারি না।”

গাছের শাখায় কাপড় বেঁধে সে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, মাটি ছুঁয়ে বলে: “আপনি যদি কোথাও থাকেন, একবার শুধু বলেন। চালাতে পারবো কিনা।” কোনো উত্তর আসে না। কিন্তু বাতাসটা হালকা হয়। গাছের পাতাগুলো হালকা নড়ে।

মুলি উঠে দাঁড়ায়। চোখের নিচে ক্লান্তির রেখা, তবু বুকটা হালকা। মুলি আজও লরি চালায়। কিন্তু লরি চালানো এখন তার কাজ না, তার ক্ষমা প্রার্থনার উপায়। প্রতিবার স্টিয়ারিং ধরার আগে সে আয়নায় দেখেÑ নিজের মুখ, নিজের দায়, নিজের পাপ।

তোজাম্মেল আযম
লেখক ও সাংবাদিক

মা বলে ডাকো

“চুপচাপ থেকে গেলে সব শব্দ হারিয়ে যায় না, কিছু শব্দ জন্ম নেয় নীরবতায়।” মুজিবনগর উপজেলার একটি ছোট শহরের সরকারি এতিমখানা। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে মা দিবসের সপ্তাহখানেক আগের দিন। ওইদিনের তপ্ত দুপুর। রোদে পুড়ছে মাঠের মাটি, গাছের পাতাও যেন ক্লান্ত। অথচ সেই খরতাপের ভেতর, একটি ছোট্ট ছেলে রাহি মুজিবনগর আম্রকাননের ছায়ায় বসে ছিল, নিঃশব্দ, নিরুত্তাপ।
তার নাম রাহি। বয়স আট, গায়ের রঙ শ্যামলা, চোখ দুটি কেমন যেন

অন্যমনস্ক, যেন বহু দূরে কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

রাহি জন্ম থেকেই এতিম। মা-বাবার মুখ কখনো দেখেনি। তার জন্য ‘মা’ শব্দটা স্কুলের বইয়ের ছড়া মাত্র।

“মা গো মা, তুমি কোথায়?” এই লাইনটি সে খুব সাবধানে লেখে, কিন্তু মনেও কি রাখে?

এতিমখানার অন্য শিশুরা মাঝে মাঝে ‘মা’ বলে কল্পনায় ডাকে- “মা যদি থাকতো, তাহলে”- কিন্তু রাহি কখনো এই খেলা খেলেনি। সে চুপ করে থাকে, যেন ‘মা’ শব্দটা তার কানে গিয়েই হারিয়ে যায়।

মা দিবস আসছে। শহরের স্কুলগুলোয় শিশুদের মায়েদের জন্য চিঠি লেখা, ছবি আঁকা, কার্ড বানানোর প্রতিযোগিতা চলছে। এতিমখানাতেও সরকারি চিঠি এসেছে- “মা দিবস উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে ছবি ও কবিতা পাঠানোর আয়োজন”।
শিক্ষিকা আপা বললেন,- “তোমরাও লিখবে, আঁকবে। মা না থাকলেও মা কেমন হলে ভালো লাগতো- এটা ভাবো।”
সবাই নিজ নিজ বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে এসেছে। কেউ লিখেছে মায়ের হাতের রান্না, কেউ ◌ি বকাবকি, কেউ মায়ের আঁচল, কেউ বা লিখেছে সৎ মায়ের যন্ত্রণার কথা…

রাহি এক কোণে বসে আছে। সে কিছুই লেখেনি। লেখার খাতাটা ফাঁকাই রেখে দেয়। লিখতে গিয়ে কলমের কালিও শুকিয়ে যায়, সে এক লাইনও লেখেনি।

পরদিন সকাল। মা দিবস।

এতিমখানার গেটে একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। নাম সায়মা। পরনে হালকা সাদা শাড়ি, চোখে ক্লান্তি, হাতে একটা চিঠি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

তিনি বললেন- “আমি… একজন শিশুকে খুঁজছি। যার নাম রাহি। সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে তার? ”সায়মা ধীরে বললেন-“হয়তো কিছুই না। কিন্তু আমি চাই, আজ তাকে ‘মা দিবস’ উপলক্ষে একটি কার্ড দিই। তার যদি ইচ্ছে হয়, আমাকে একবার ‘মা’ বলে ডাকতে পারে।”
কথাটা শুনে কারো মুখে কোনো শব্দ এলো না।

রাহিকে ডাকা হলো। ছেলেটা এগিয়ে আসলো চুপচাপ। সায়মা মৃদু হেসে তার হাতে একটি কার্ড দিলেন। কার্ডে লেখা:
“যদি কখনো মা ডাকতে ইচ্ছে করে, আমি দাঁড়িয়ে থাকব গেটে। আমি জানি, তুমি হয়তো আমার না, কিন্তু আমি তো তোমার হতেই পারি।” রাহির চোখে জল এল না। সে কার্ডটা দেখে বলল না কিছু। শুধু একটু তাকিয়ে রইল মহিলার দিকে। তারপর আস্তে করে বলল এক শব্দ-
“মা”
একটি মাত্র শব্দ। এতিমখানার সেই সকাল এক মুহূর্তে যেন থমকে গেল। সায়মা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় তখন রাহির জন্য সেই বুকটাই।
মা দিবস মানে শুধুই ফুল বা কার্ড নয়। মা দিবস এমন এক অনুভূতির নাম, যা জন্মসূত্রে না হলেও ভালোবাসা দিয়ে গড়া যায়। ‘মা’ এই শব্দটির কোনো সংজ্ঞা নেই। কখনো তিনি গর্ভধারিণী, কখনো আশ্রয়দাত্রী, কখনো কেবল একটি অচেনা হাত, যেটা আপন করে নেয় নিঃশর্তে।

এই গল্পটি সেইসব মায়েদের জন্য- যারা সন্তান জন্ম না দিয়েও ‘মা’ হয়ে উঠেন। আর তাদের জন্যও, যারা কখনো কাউকে ‘মা’ বলে ডাকেনি, কিন্তু একদিন ডেকেছে ভয় পেরিয়ে, বুকের গভীর থেকে।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক